উদ্ভাবন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

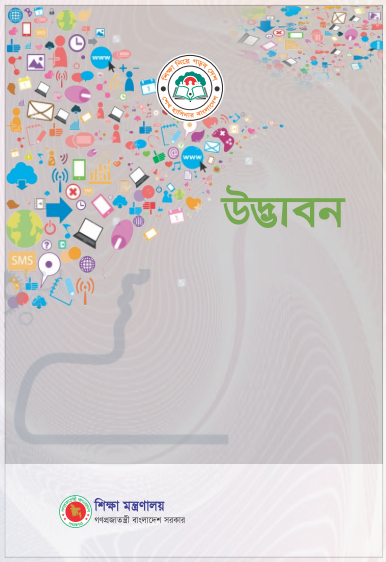

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা : নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা : মো. সোহরাব হোসাইন
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
: মো. আলমগীর
সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ : ড. অরুণা বিশ্বাস
অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
: ডা. মো. ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
: মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার
যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
: প্রফেসর ড. মো. সেলিম মিয়া
পরিচালক, মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
: স্বপন কুমার নাথ
উপপরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), নায়েম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
: মো. আলমগীর মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), ঢাকা কলেজ, ঢাকা

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৭

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : এস.এম. সালাহউদ্দিন

মুদ্রণ : চিস্তিয়া ট্রেডার্স এন্ড প্রিন্টার্স
১৬৪ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা
০১৭৮৭ ৪৯৩৭২২
e-mail: chistia.traders@gmail.com

সূচিপত্র

আমরা এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করবো ০১
নুরুল ইসলাম নাহিদ

আগে নিজেকেই বদলে নিন ০৩
মো. সোহরাব হোসাইন

নাগরিক সেবায় সৃজনশীলতা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তরিক সেবা প্রদান করুন, নিজের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করুন ০৪
মো. আলমগীর

উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনার কথা ০৬
ড. অরুণা বিশ্বাস

প্রযুক্তির সহজ জাদু ০৭
দৌলতুজ্জামান খান

অনলাইন সেবা : নতুন জানালা ১০
প্রফেসর এ কে এম ছায়েফ উল্যা

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ১২
প্রকৌশলী মো. আবদুল কুদ্দুস সরদার

পিবিএম (PBM) সহজীকরণ ১৫
কামরুন নাহার

অন্বেষার আলো অন্বেষণ ১৬
মো. মাহফুজুর রহমান

ইনোভেশন ১৮
কামরুজ্জামান মো. জাহাঙ্গীর হুসাইন মিঞা

শিক্ষার্থীদের মনন গঠনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ২০
মো. মহিউদ্দিন

সক্রিয় পাঠদান ২২
মো. আব্দুস সাত্তার সরকার

মোবাইল ব্যাংকিং ২৩
লিপিকা দত্ত

বিন্দু থেকে সিন্ধু ২৪
মো. আবুল কালাম আজাদ

অ্যালবাম ২৬

সম্পাদনা প্রসঙ্গ

উদ্ভাবনী গল্প বানানো বা প্রচারের উদ্দেশে এই প্রকাশনা নয়। এর মূল লক্ষ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনীদলকে উদ্দীপ্ত করা এবং অনুশীলনে অবিরত যুক্ত রাখা। এই প্রকাশনার গুণ-মান নির্ধারণকে আমরা সচেতনভাবেই খেয়ালে নেইনি। কর্মীদের চিন্তা বা চিন্তাগত চেষ্টা মন্ত্রণালয়ের দলিলে লেখা হচ্ছে সেটাই তাদের জন্য বড় ধরনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ দেবে বলে বিশ্বাস করি। আর সেই বিশ্বাস থেকেই 'উদ্ভাবন' ছাপানো হলো। আমাদের মধ্যে বিশেষ কোন ছন্দ-পতন না ঘটলে আগামীর 'উদ্ভাবন' অবশ্যই নতুন বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

যাঁরা প্রথম সংখ্যায় লেখা দিয়ে এ প্রকাশনায় অবদান রেখেছেন, তাঁদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাঁরা 'উদ্ভাবন' প্রকাশে কম-বেশি, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ড. অরুণা বিশ্বাস
চিফ ইনোভেশন অফিসার ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আমরা এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করবো

নুরুল ইসলাম নাহিদ

আমাদের শিক্ষা পরিবার এদেশের বৃহত্তম পরিবার। এ পরিবার চালাতে গিয়ে আমাদের হাজারো প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং অর্থও দিচ্ছেন। তার পরও চাহিদা বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটির মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো চাহিদার তুলনায় সম্পদের স্বল্পতা। দেশি বিদেশি সকল পরামর্শক শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। যা হোক, বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের ৮৫ ভাগ বা তারও বেশি ব্যয় হয় বেতন-ভাতা বাবদ। সে অর্থে উন্নয়ন এখানে মুখ্য বিবেচনায় রাখা যায় না।

সম্পদের এরূপ টানাপোড়েন আছে বলেই মাথার মধ্যে সারাক্ষণ নানা রকম চিন্তা-ভাবনা কাজ করতে থাকে। সেই চিন্তা-ভাবনার মধ্য হতেই একদিন শিরোনামের এই কথাটি আমার সহকর্মীদের বলি। এখন দেখি এর একটা দার্শনিক মূল্য আছে এবং কথাটিকে আমি নিজেই বিশ্বাস করে ফেলেছি। এখন প্রায়শই সহকর্মীদেরকে এই কথাটা বলে থাকি।

শিক্ষা নিশ্চয়ই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন– 'শিক্ষায় ব্যয় নয়, আমরা বিনিয়োগ করি– ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য'। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সরকারের সামনে আরও অগ্রাধিকার রয়েছে। শিক্ষায় আমরা যে টাকা পাই তা পুরোটাই যেন সৎভাবে কাজে লাগে– দুর্নীতি, অপচয় বা অপব্যবহার না হয় সেদিকে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে। সকলের মধ্যে সচেতনতা, দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। জনগণের অর্থ– যাদের অর্থে আমরা লেখাপড়া করছি, উন্নয়ন কাজ করছি, বেতন পাচ্ছি, তাদের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। একথা মনে রেখে সম্পূর্ণ অর্থ সততার সাথে কাজে লাগাতে হবে এবং প্রত্যেককে বেশি বেশি কাজ করতে হবে। কম টাকায় বেশি কাজ করতে হবে। এই মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি।

ভেবে দেখেছি, সম্পদ বা সক্ষমতা রাতারাতি বাড়িয়ে নেওয়ার মত বিষয় নয়। তা হলে নিজেদের আয়ত্বের মধ্যে বিকল্পসমূহ কী কী আছে? ঠিক এরকম প্রেক্ষাপটে আমার নিজের মধ্যেই প্রথম এই বোধটা কাজ করছে যে, আমরা যদি একই সময়ে একই বেতনে একটু বেশি কাজ করি বা করতে পারি তাহলেই তো এগোতে পারি এবং সেটা করাও সম্ভব।

যিনি প্রকল্পের কাজ দেখতে বরগুনা যান তিনি যদি সেই সফরে দু-তিনটি প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক খোঁজ-খবর নেন, তা হলে ওই প্রতিষ্ঠানগুলো পরবর্তী অন্তত দু-মাসের জন্য চাঙ্গা হয়, ভাল চলে। এভাবে যিনি পরিদর্শন কাজে রাজশাহী যান, তিনি তার সফরের নিকটবর্তী চলমান প্রকল্পের কাজের খোঁজ-খবর করতে পারেন। তাতে মনিটরিং বৃদ্ধি পায়। আবার যিনি তদন্তে কক্সবাজার যান, তিনি যদি তার সফরে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিজিট করে পরামর্শ রেখে আসেন তাতেও চমৎকার কাজ হয়।

মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রত্যেকেই যদি একটু বেশি কাজ করতে অভ্যস্ত হই তাতে কিন্তু কারোরই ভ্রমণ ব্যয় বাড়ছে না। অথচ সামগ্রিক মনিটরিং জোরদার হয়ে যায়, শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন আসে।

এভাবে যিনি বিদেশে যান তিনি যদি ফিরে এসে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের কর্মপরিবেশে নতুন ধারা বা প্রযুক্তির সংযোগ ঘটান তাহলে কাজের গতি বাড়ে। প্রকল্পের কাজের গুণগত মান ঠিক রেখে যথাসময়ে কাজ শেষ করতে পারলে অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। কাজের মান ঠিক রেখে যে কোনো ধরনের অপচয় রোধ করে পুরো কাজটা করতে হবে। ঘুষ, অপচয়, অপব্যবহার সম্পূর্ণই বন্ধ করতে হবে। আবার মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ দৈনিক হয়তো দু-টি বা তিনটি বিষয় নথিতে উপস্থাপন করে থাকেন। আরও একটু মনোযোগী বা আন্তরিক হলে তারা সেখানে দৈনিক চারটা বা পাঁচটা বিষয় উপস্থাপন করতে পারেন। আমরা সকলেই এখন সেভাবে কাজ করতে শুরু করেছি। আর এভাবে বেশি বেশি কাজ করতে অভ্যস্ত হলে নির্ধারিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এদেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। ঠিক এই রকম ভাবনা হতেই আমি বলে থাকি– 'আমরা এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করবো'।

আগে নিজেকেই বদলে নিন

মো. সোহরাব হোসাইন

ইতোমধ্যেই 'উদ্ভাবন' কথাটি জনপ্রশাসন ও সকল মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রকল্প আর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগে এ বিষয়ে বহু প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে। মাঠ প্রশাসনের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর সুফলও আমরা পেতে শুরু করেছি। মাঠ প্রশাসন অনেক বেশি সেবামুখি ও গতিশীল হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের নৈমিত্তিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণার মূল কথা হচ্ছে, প্রচলিত সেবাদান পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া সহজ করা। কম আসা-যাওয়ায়, কম খরচে, কম সময়ে সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এসব কিছু মেনে নিয়েই উদ্ভাবন প্রসঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বা বোধকে একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। আমাদের প্রথাবদ্ধ আচরণ হচ্ছে আমরা রোজ অফিসে আসি-যাই, কাজ করি, বেতন পাই। ব্যাপারটি যেন এমন যে, চাকরিতে নাম আছে বলেই আমি চাকরিজীবী। দীর্ঘকালে বেড়ে ওঠা এই প্রথা সরকারি ব্যবস্থাপনার জগতে একটা কর্মবিমুখ অপসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভীষণ বাজে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ডানে-বায়ে, উপরে-নিচে, এই-সেই অজুহাতে কাজ করি না। ঝামেলা হতে পারে, দায় আসতে পারে সে অজুহাতে কাজকে এড়িয়ে চলি। বিষয়টি চরম অনৈতিক এবং চাকরির শর্তে মারাত্মক বরখেলাপ। তাই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে বিদ্যমান ভাবমূর্তির সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে প্রশাসনে বাস্তবিক সেবা-সংস্কৃতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি এই মহৎ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। আমাদের সবার চেষ্টায় বদলাতে হবে স্বদেশকে। ধীরে চলার সুযোগ নেই। নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশকে বদলাতে হলে প্রত্যেকেই আগে নিজেকে বদলে ফেলা জরুরি। প্রত্যেককেই নিজের মন থেকে দৃঢ়তার সাথে প্রত্যয়ী হতে হবে যে, আমি সেবক, আমি সেবা দেব। আর এভাবে নিজের কাছে নিজেই অঙ্গীকারাবদ্ধ হই যে, আমি কাজটি করবো, সেবাটি দেব বা বিষয়টি নিষ্পত্তি করবো। তার কাছে নিষ্পত্তির উপায় কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। নিশ্চিতভাবে কোন না কোন উপায় এসে তার হাতে ধরা দেবে। বিপরীতে যিনি সেবামুখি নন তারও আছে হাজারটা অজুহাত। আইন-বিধি নেই, নিয়মে পড়ে না, আরও কাগজপত্র লাগবে, দরখাস্ত ঠিক হয়নি, একমাস পরে আসেন, ইত্যাদি কত কি? তাই বলছি একজন সেবককে সেবা প্রদানের উপায় আবিষ্কারের জন্য ভিন্নভাবে গবেষক হওয়ার দরকার হবে না। সেবার মন থাকলেই উপায় বের হয়ে যাবে। নিজেকে সেবক ভাবুন, সেবায় ব্রতী হোন, কাজ করুন, সেবা দিন। আর তাতে দু-পক্ষের জয় হবে। গ্রহীতা সেবা পাবেন। তিনি আপনার প্রতি আস্থাশীল হবেন, শ্রদ্ধা করবেন, ভালোবাসবেন, আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। শেষ পর্যন্ত উদ্ভাবন প্রসঙ্গে আমার ব্যবস্থাপত্রে প্রথম যে উপায়টি লিখতে চাই তা হলো– 'আগে নিজেকেই বদলে নিন'।

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নাগরিক সেবায় সৃজনশীলতা

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে আন্তরিক সেবা প্রদান করুন, নিজের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করুন

মো. আলমগীর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট গুণগত জনসেবা নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্বায়নের এ যুগে সবকিছুই প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। সরকারি সেবা প্রদানের বিরাট তালিকা ও পদ্ধতিসমূহ একইভাবে বদলাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। পুরাতন সেবার সাথে নতুন নতুন সেবা প্রদানের জন্য উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা তাই অপরিহার্য। পুরাতন সেবা সহজে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন সেবা আরও সুন্দরভাবে জনগণের দোরগোড়ায় উপস্থাপনের জন্য সরকার জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে জনসেবায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ফলে প্রতিবছর জনসেবার ক্ষেত্রে যোগ হচ্ছে সৃজনশীল নতুন পদ্ধতিসমূহ। দেশের নাগরিকগণ উন্নত সেবা পেয়ে হচ্ছেন কৃতার্থ, সেবাপ্রদানকারীরা পাচ্ছেন মানুষের ধন্যবাদ, সরকার অর্জন করেছে জনগণের আস্থা। দেশ এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের শিখরের দিকে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রকল্প ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে নানাবিধ প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করছে। উদ্ভাবনসমূহের গুণগত বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রদান করা হচ্ছে দেশে বিদেশে নানাবিধ প্রণোদনামূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং পুরস্কার।

দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং পুরস্কার জনসেবায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন তরান্বিত করে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেবা প্রদানকারীদের হৃদয়ে আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগলে তা পরশপাথরের মতো উদ্ভাবনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আমি মনে করি। সেবা প্রদানের জন্য যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে আন্তরিকতা, জনগণকে নিজের সর্বোচ্চ উজাড় করে দিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য নিজের নিকট নিজের দৃপ্ত অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রচলিত কোন আইন, বিধি, সীমিত বাজেট ও জনবলের স্বল্পতা সাময়িক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও দিন শেষে তা আন্তরিকতার নিকট হার মানে। জনসেবায় যোগ হয় নতুন উদ্ভাবন। কোন ব্যক্তি যখন আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, মানুষ তখন তার সেবায় গুণমুগ্ধ হন। প্রতিদানে তারাও তাকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন। গুণগত মান নিশ্চিত হলে লাভ অবধারিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনসেবার মনোন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন, পদোন্নতি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করেছে। সমাজে তাদের স্বীকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ।

সচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ , শিক্ষা মন্ত্রণালয়

আমরা আজ আমাদের নিজেদের বিকাশের জন্য, নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য, নিজেদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য একটি কৌশল গ্রহণ করতে পারি, একটি সৃজনশীল তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করে একান্তই আন্তরিকতার সাথে নিজের সর্বোচ্চ উজাড় করে জনগণের শতভাগ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদেরকে নিজের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে নিজের মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভার সর্বোচ্চ ব্যবহার করি। বিনিময়ে নিজের উন্নত সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ নিশ্চিত করি। এটিই হোক আমাদের আজকের সৃজনশীল অঙ্গীকার।

উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনার কথা

ড. অরুণা বিশ্বাস

টুনা-টুনির পিঠা খাওয়ার গল্পটি দিয়েই শুরু করা যাক। চাওয়া মাত্রই টুনি টুনাকে কিন্তু পিঠা খাওয়াতে পারেনি। তার জন্য দু-জনকেই অনেক আয়োজন করতে হয়েছিল। সে রকমই মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন দলে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম উদ্ভাবনের আয়োজন আসলে সহজ কিছু নয়। এতে অনেক কিছু অনুষঙ্গ লাগে। শেষ পর্যন্ত একটা পাকাপোক্ত নেটওয়ার্কিং এর মধ্য দিয়ে উদ্ভাবনের পাতন হয় এবং চলতে থাকে। 'উদ্ভাবন' আজ সকল প্রশাসনিক ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় নৈমিত্তিক প্রসঙ্গ হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থাপনায় যুক্ত থেকে ইতোমধ্যে আমি কাঁচা-মিঠা কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফেলেছি। প্রথাবদ্ধ প্রচলিত অবস্থা হতে নতুনের দিকে বা পরিবর্তনের দিকে যেতে চাইলে অনেক বাঁকে থামতে হয়।

ধারণা খোঁজা, ধারণাকে ধরা, বিশ্লেষণ করা, পরীক্ষায় বসা, চূড়ান্ত করা এবং শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া,– সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং লেগে থাকার বিষয়। উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনা মূলত একটা নিবিড় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। প্রথমত, প্রয়োজন একদল কাজ পাগল মানুষের, তাদের পাশে প্রয়োজন আর একদল সহযোগী মানুষ, লাগে লজিস্টিক পরিবেশ, অর্থ-সম্পদ। সর্বোপরি আবশ্যক কর্তৃপক্ষের বাস্তব সংযোগ। উদ্ভাবনের জন্য ডানে-বায়ে, উপরে-নিচে চতুর্মুখি অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করা রোজকার কাজ। কে কোথায় কোন ধারণা মাথায় নিল, কে কোথায় কি জন্য গতি থেমে গেল, কে আরও গতি চায়, কোথায় কোন নিয়ম-বিধি জট পাকালো, এসব নিয়ে উদ্ভাবন দলকে নিয়মিত বসতে হয়, ভাবতে হয়, পথ করতে হয় এগিয়ে যাবার। অথচ এর সবই করতে হয় প্রাত্যহিকতার বাইরে থেকে। অভিজ্ঞতা হতেই বলছি, উদ্ভাবন সংস্কৃতি লালন করতে হলে সকল ইউনিটে উপযুক্ত এবং স্থায়ী সংস্থাপন থাকা খুব জরুরি। জরুরি সেরকম মানসিকতার লোকজনের। আবার সেসব লোকজনের জন্য দরকার হয় উপযুক্ত কর্মপরিবেশের। শুধু ভাসমান মানুষজন আর ধার করা লজিস্টিক দিয়ে উদ্ভাবনকে সংস্থাপন করা দুঃসাধ্য বা প্রায় অসম্ভব। আরও বলি, কেবল সরকারি আদেশ প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাবন সংস্কৃতি থিত হয় না। আমাদের সবার উচিৎ উদ্ভাবনকে গুরুত্বের সাথে দৈনন্দিন চর্চার মধ্যে রাখা, হোক তা ব্যক্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক। মোদ্দা কথা, যোগ্য আর স্থায়ী সংস্থাপন ছাড়া উদ্ভাবন চর্চা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না। মানুষের সক্ষমতাই আমাদের ভরসা। একদিন মানুষ পাথরে পাথর ঘষে আগুনের খোঁজ পেয়ে সভ্যতার যাত্রা শুরু করেছে। সেই মানুষই আজ মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ইংগিত পেয়েছে। একদল খেটে যাচ্ছে মহাবিশ্বের দেশে পৌঁছার জন্য মহাতত্ত্ব চূড়ান্ত করতে। এভাবেই চলমান আমাদের উন্নয়ন আর সভ্যতা।
মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির জয় হোক।

চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রযুক্তির সহজ জাদু

দৌলতুজ্জামান খান

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস। গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে আকস্মিকভাবে একটি মাদরাসা পরিদর্শন করি। সময়টা ছিল আনুমানিক সকাল ১১ ঘটিকা। প্রবেশ মুখেই কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্লাস থেকে বের হয়ে চলে যেতে দেখলাম। কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে শিক্ষার্থীরা– ক্লাস শেষ, বলতে বলতে দৌড়ে পালিয়ে যায়। অন্যান্য ক্লাসরুমে গিয়ে শিক্ষার্থীদের হই হুল্লোড়ে ব্যস্ত দেখতে পাই। ক্লাসে কোনো শিক্ষক নেই। শিক্ষকের কথা জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষার্থীরা জানায়– স্যার নেই। অধ্যক্ষ স্যারের কক্ষে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে, উপস্থিত পিয়নকে জিজ্ঞাসা করলে বলল– স্যার বাইরে গেছেন, কোথায় গেছেন জানে না। তখন ফোনে অধ্যক্ষকে আমার অবস্থানের বিষয়টি অবহিত করি। তিনি প্রায় আধঘণ্টা পরে মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীদের ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়া, ক্লাসে শিক্ষকের উপস্থিত না থাকার বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি তার অপারগতার কথা অকপটে স্বীকার করেন। তিনি জানান, কোন কোন শিক্ষককে সময়মত ক্লাসে আসার কথা বললে অনেক সময় বিভিন্ন হুমকি দিয়ে থাকেন। তিনি আরো জানান, অনেকে ক্লাসে না এসেও হাজিরা দিয়ে যান। এসব শিক্ষকদের কারো কারো স্থানীয় প্রভাবশালীর সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আবার কেউ কেউ বয়োজ্যেষ্ঠ বলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে জানান তিনি।

সমস্যা ও সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) হিসেবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। চিন্তা করি কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই সমস্যা হতে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। এরপর ভাবতে থাকি এবং বিভিন্ন মাদরাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করি ও বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে থাকি। একেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেক রকম সমস্যা। সকল সমস্যা একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসে সমাধানের উপায় খুঁজতে থাকি এবং ২০১৫ সালে জেলা ডিজিটাল ইনোভেশন ফেয়ারে কয়েকজন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারের সাথে শেয়ার করি। সকলেই জানান একসাথে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। আলাদা আলাদা ভাবে সমাধান করতে হবে। কিন্তু আমি একসাথে সমাধান চাই; একথা শুনে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান স্পেকট্রাম আইটি সলিউশন লি. আমার কাছে এক মাসের সময় চান এবং আমার আইডিয়াটি তারা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে বলেন। তাদের সাথে রাত দিন বিভিন্ন আলোচনা করে একটি সমাধানের উপায় খুঁজে পাই। পরবর্তী সময়ে এটি ইনোভেশন আইডিয়ার আওতায় এনে বিভিন্ন গবেষণা, সেমিনার, আলোচনা ও পর্যালোচনা করে একটি প্লাটফর্মে এনে একটি ডেমো ভার্সন তৈরি করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে লাংগলমোড়া শামছুল উলুম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদরাসাকে বেছে নেয়া হয়। অধ্যক্ষ নিজে আগ্রহের সাথে সিস্টেমটি গ্রহণ করেন। শতভাগ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন হবার পর বর্তমানে ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৯৭৫১ জন শিক্ষার্থী, ৭৩৪ জন শিক্ষক

ন্যাশনাল কনসালটেন্ট-পোর্টাল ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেশালিষ্ট, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোজেক্ট (a2i), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

ও ১৮৭ জন কর্মচারী এ প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে www.eductg.gov.bdI www.eductg.com ডোমেইনের মাধ্যমে মাত্র একটি প্লাটফমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের উপস্থিতি নিজ অফিস হতেই তদারকি করা যায়। অফিসে থেকেই শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সম্পর্কে মনিটরিং করতে পারি। শিক্ষকগণের অনলাইনে ছুটির আবেদন করার ব্যবস্থা থাকায় কেউ ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকতে পারে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে EMS এর আওতা

১। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি যে কেউ দেখতে পারবে এবং হাজিরা খাতা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না। ফলে ক্লাসে হাজিরার জন্য নির্ধারিত সময়ের সম্পূর্ণ অংশ সুব্যবহৃত হবে এবং এই সময়টি উক্ত ক্লাসের জন্য যথাযথভাবে ব্যয় করা যাবে;

২। শিক্ষক/কর্মচারীদের বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত হবে। এতে শিক্ষকদের দেরিতে উপস্থিতির প্রবণতা কমবে;

৩। ১০ দিন, ১৫ দিন বা ৩০ দিনের ঊর্ধ্বে শিক্ষার্থী বা শিক্ষক-কর্মচারীর কেউ অনুপস্থিত থাকলে ওয়েবসাইট হতে রিপোর্ট আকারে প্রিন্ট করা সম্ভব;

৪। প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করা সম্ভব;

৫। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় তদারকি করতে পারবেন;

৬। অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা পরে উপস্থিত হিসেবে দেখানোর আর কোন সুযোগ থাকবে না;

৭। একই ফরমেটে রেজাল্ট তৈরি করা সম্ভব। এতে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষকগণ বুঝতে পারবেন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন;

৮। মোবাইল এপস-এর মাধ্যমে অনুপস্থিতির বিষয়টি অভিভাবক ও শিক্ষকগণ জানতে পারবেন। এমনকি মোবাইল এস.এম.এস-এর মাধ্যমে উপস্থিতির বিষয়টি নিয়মিত জানতে পারবেন;

৯। মনিটর এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার হার কমিয়ে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব;

১০। মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, জেলা-উপজেলা প্রশাসন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা বিভাগ, গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, শিক্ষক, সুধী সমাজ, গবেষক, শিক্ষার্থী ও প্রয়োজনে সকলে বিভিন্ন তথ্যাদি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

১১। এটি পরিচালনার জন্য আলাদা ইন্টারনেট কানেকশন ও আলাদা কোন জনবলের প্রয়োজন হবে না।

১২। শুধু এক সেট ফাইলের মাধ্যমে ফলাফল আপলোড করলে সাথে সাথে সিস্টেমে হাল নাগাদ হয়ে যাবে এবং সকলের রেজাল্ট তৈরি হয়ে যাবে;

১৩। মোবাইল এপস থাকায় প্রধান শিক্ষক যে কোনো স্থান হতেই শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের হাজিরা দেখতে পারেন;

১৪। মোবাইল এপস এবং সিস্টেমের মাধ্যমে অভিভাবকগণ সন্তানের বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতিও দেখতে পারবেন।

আইডিয়াটি বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত সুফল

১। শিক্ষক/কর্মচারীদের উপস্থিতি প্রায় শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে;
২। শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির মাত্রা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে;
৩। সন্তানের গতিবিধি অভিভাবকদের নজরদারির মধ্যে এসেছে;
৪। নিজের সন্তান বা শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতি শিক্ষক বা অভিভাবক বিশ্লেষণ করতে পারছেন;
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তদারকি শতভাগ করা সম্ভব হয়েছে;
৬। শিক্ষকগণ আরো বেশি সচেতন হয়েছেন;
৭। প্রতিষ্ঠান প্রধান তাঁর শিক্ষকদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন;
৮। উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বিষয়টি কমিটির সদস্য এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা পর্যালোচনা করতে পারছেন;
৯। কোনো তথ্য কাউকে আলাদাভাবে আপলোড করতে হয় না। সকল বিষয়াদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে। ফলে তথ্য বিভ্রাটের কোন সম্ভাবনা থাকে না;
১০। শিক্ষার মানোন্নয়ন, ঝরেপড়া রোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

অনলাইন সেবা : নতুন জানালা

প্রফেসর এ কে এম ছায়েফ উল্যা

সবুজ বাবা-মার বড় ছেলে। তাদের বাড়ি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল সমুদ্র তীরবর্তী সূর্যমুখী গ্রামে। বাবার অবর্তমানে সংসারের প্রয়োজনে স্থানীয় ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি শুরু করে সবুজ। কিছুদিনের মধ্যেই তার চাকরি এমপিওভুক্ত হয়। মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাদরাসার অফিসিয়াল যাবতীয় কাজ সবুজকে দিয়ে করাতেন। এছাড়া মাদরাসার স্বীকৃতি নবায়ন, কমিটি অনুমোদন, পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করানো, পরীক্ষার ফি ও আবেদনপত্র জমা দেওয়া ইত্যাদি কাজে ঢাকায় অবস্থিত একমাত্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে সবুজকেই সবসময় পাঠাতেন। সবুজও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সকল দায়িত্ব পালন করে আসছে চাকরির শুরু থেকে।

কোন একটা কাজে কুতুবদিয়া থেকে ঢাকায় এসে মাদরাসার কাজ শেষ করে ফিরে যেতে ৪/৫দিন সময় লাগে। আবার কুতুবদিয়া থেকে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ায় একজন মানুষের কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়। যে কোন সময় দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। সময় ও অর্থের অপচয় কীভাবে রোধ করা যায় এবং ঢাকায় না গিয়েও খুব সহজেই মাদরাসার কাজগুলো করা যায় সে বিষয়ে অনেক দিন থেকেই সবুজ চিন্তা-ভাবনা করছিল। সে তার খুব কাছের বন্ধু সেলিমের সাথে পরামর্শ করে। সেলিম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে একটা কলেজে অধ্যাপনা করছে। পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে একটা কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনা করে। এলাকার ছেলেমেয়েদের কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মমুখি করার চেষ্টা করে। ঘরে বসে কীভাবে আউট সোর্সিং-এ অর্থ উপার্জন করা যায় সে বিষয়ে কাউন্সেলিং করে। সবুজের সমস্যার কথা শুনে সেলিম বুঝিয়ে বলে– 'ডিজিটাল যুগে সবকিছু ঘরে বসেই করা সম্ভব। যেমন আমরা এখন বাস-ট্রেন-বিমানের টিকিট বুক করি ইন্টারনেটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করি, বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করি, পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করি। সারাবিশ্বে কোথায় কি ঘটছে মুহূর্তের মধ্যেই দেখতে পাই। শুধু প্রয়োজন ইন্টারনেট সংযোগ থাকা ও কম্পিউটার চালানোর প্রশিক্ষণ। সব অধিদপ্তরই তো ই-ফাইলিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হচ্ছে এবং অনলাইনে সকল সেবা পাবার সুযোগ করে দিচ্ছে এই সরকার। ইন্টারনেটের যুগে সবকিছুই মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে। তাই মাদরাসার যে কাজগুলো ঢাকায় গিয়ে করতে হয় একদিন হয়তো সেগুলো মাদরাসায় বসেই করা সম্ভব হবে।' website থেকে চেয়ারম্যান সাহেবের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে সেলিম। তারপর চেয়ারম্যান সাহেবের নম্বরে মোবাইল করে সবুজ, তার সমস্যার কথা বলে। সবুজের কথা শুনে চেয়ারম্যান সাহেব বলেন– 'মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সাতক্ষীরা থেকে সুনামগঞ্জ। সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মাদরাসা প্রধানদের ঢাকায় অবস্থিত একমাত্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে উপস্থিত হয়ে কাজ করানো সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য।

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন। মাদরাসা প্রধানদের কষ্ট লাঘব করার জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রায় সব কাজই পর্যায়ক্রমে অনলাইন সেবার আওতায় আনা হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফি ও আবেদনপত্র জমা দেওয়া, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, পরীক্ষকের আবেদনপত্র, উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করা ইত্যাদি কাজ অনলাইনে করা যাচ্ছে। বোর্ডে না এসে অনেক কাজ অনলাইনে করা যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই কমিটি অনুমোদন ও স্বীকৃতি নবায়ন কাজও অনলাইন সেবার আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি নবায়ন ও কমিটি অনুমোদন কাজ অনলাইন সেবার আওতায় আনার জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। সকল মাদরাসার নথিভুক্ত তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি (in-put) করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ও সারাদেশের মাদরাসাগুলোর কম্পিউটার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্বীকৃতি নবায়ন ও কমিটি অনুমোদনের আবেদন ও ফি কীভাবে পাঠাতে হবে, প্রাসঙ্গিক কি কি তথ্য কীভাবে প্রেরণ করতে হবে, কীভাবে চিঠি প্রিন্ট করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে বিজ্ঞপ্তিতে।' চেয়ারম্যান সাহেবের কথা শুনে সবুজ নিশ্চিত হয়ে ফোন রেখে দেয়।

২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সবুজের মাদরাসার স্বীকৃতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু স্বীকৃতি ফি ও ঢাকায় যাওয়া-আসার খরচ সংগ্রহ করতে না পারায় যাওয়া হচ্ছে না। এ দফায় স্বীকৃতি ফি ও যাতায়াত বাবদ মোট দশ হাজার টাকা প্রয়োজন। স্বীকৃতি নবায়নের জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে অনলাইন সেবা চালু হলে যাতায়াত বাবদ পাঁচ হাজার টাকা কম ব্যয় হতো। একদিন সবুজ ঢাকায় যাওয়ার জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করতে সকাল সকাল মাদরাসায় আসে। মনে মনে সে ঠিক করে যদি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের website-এ স্বীকৃতি নবায়ন ও কমিটি অনুমোদনের বিজ্ঞপ্তি না পায়, তাহলে সে ঢাকা যাবে। তারপর সবুজ সেলিমের সাথে যোগাযোগ করে তার কম্পিউটার সেন্টারে যায় এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের website সার্চ করতে বলে সেলিমকে। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের website ওপেন করেই অনলাইনে স্বীকৃতি নবায়ন ও কমিটি অনুমোদনের বিজ্ঞপ্তি দেখতে পায়। সবুজ খুশিতে লাফিয়ে ওঠে সেলিমকে জড়িয়ে ধরে এবং আবেদনপত্র ও ফি জমা দেওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা চায়।

সেলিম সবুজকে প্রয়োজনীয় ফিসহ প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলে; অনলাইনে আবেদন পাঠাবে। কয়েক ঘণ্টা পর কাগজ পত্র নিয়ে সবুজ সেলিমের কম্পিউটার সেন্টারে আসে। তার পর প্রয়োজনীয় ফিসহ প্রথমে কমিটি অনুমোদনের আবেদনপত্র ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র স্ক্যান করে প্রেরণ করা হয়। কিছুক্ষণ পর সবুজের মোবাইলে একটা মেসেজ আসে, তার আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছে। একই পদ্ধতিতে স্বীকৃতি নবায়নের ফিসহ আবেদনপত্র ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। আবেদনপত্র গ্রহণ করার ফিরতি মেসেজ আসে। এক সপ্তাহ পর সবুজের মোবাইলে পুনরায় মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড হতে মেসেজ আসে, তার আবেদনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেলিম মাদরাসার শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখে মাদরাসার কমিটি অনুমোদনের চিঠি ও স্বীকৃতি নবায়নের চিঠি চলে এসেছে। তখন ডাউনলোড করে চিঠি দু-টি প্রিন্ট করে দেয় সেলিম। এত সহজে কাজ দু-টি সম্পন্ন হওয়ায় সবুজ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে কম্পিউটার, অনলাইন সেবা, ইন্টারনেট ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

প্রকৌশলী মো. আবদুল কুদ্দুস সরদার

দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব পালন, পরীক্ষা পরিচালনা ও বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শুরুতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম দিয়ে যাত্রা করলেও বর্তমানে কৃষি ডিপ্লোমা, মেডিকেল টেকনোলজি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল), এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট কোর্স ও অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্স, জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘণ্টা মেয়াদি) শিক্ষাক্রম ও কম্পিটেন্সি বেসড ট্রেনিং শিক্ষাক্রমসহ সকল শিক্ষাক্রমের প্রায় আট হাজার প্রতিষ্ঠান নিয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে শিক্ষার্থী 'রেজিস্ট্রেশন' অন্যতম। রেজিস্ট্রেশন শাখা বোর্ডের প্রশাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। একজন উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন)–এর তত্ত্বাবধানে রেজিস্ট্রেশন শাখা পরিচালিত হয়। প্রতিবছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের প্রায় নয় লাখ শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াকে আমরা দু-টি ভাগে বিভক্ত করতে পারি, এক : পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতি, দুই : বর্তমান আধুনিক পদ্ধতি বা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি। পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতি কেমন ছিল তার থেকে বর্তমান অনলাইন পদ্ধতি কীভাবে এলো, নিচে এর ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া হলো;

ম্যানুয়াল রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় ৩১টি শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়। এর মধ্যে জাতীয় দক্ষতামান বেসিক ট্রেড (৩৬০ ঘণ্টা মেয়াদি) শিক্ষাক্রমকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পরি। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় প্রায় ৫০০ বেসিক ট্রেড প্রতিষ্ঠান ছিল। রেজিস্ট্রেশন করত (বছরে ২ বার) প্রায় চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী। শুরুতে প্রতিষ্ঠান প্রধান বোর্ডে এসে রেজিস্ট্রেশন শাখা থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করতেন। একটি প্রতিষ্ঠানে যতজন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে সে পরিমাণ ফরম সংগ্রহ করতেন। ফরমগুলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পূরণ করে ফরমের ২ পাশে (শিক্ষার্থীর) দু-টি ছবি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করে ফরম আবার একত্রিত করে বোর্ডে জমা দিতে হত। তখন শুধু সোনালী ব্যাংকের ড্রাফটের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে হত। রেজিস্ট্রেশন ফরম অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পূরণ করত, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পূরণ করত। রেজিস্ট্রেশন ফরম হাতে পূরণ করায় বানান ভুল হত, অনেক ক্ষেত্রে তথ্য ঠিকমত পূরণ না হওয়ার কারণে বোর্ডে এসে ফরম পূরণ করতে হত। অনেক লোক একসঙ্গে বোর্ডের বিভিন্ন ফ্লোরে, চেয়ারে, বোর্ড ক্যাম্পাসে বসে এই কাজগুলো করাতে বোর্ডের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটতো। প্রতিষ্ঠানের লোকদেরও অনেক

পরিদর্শক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

অসুবিধা হতো। উক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করে নির্ধারিত ফিসহ রেজিস্ট্রেশন শাখায় দেখাতে হত।

রেজিস্ট্রেশন কার্ড, ছবি ও ব্যাংক ড্রাফট চেক করতেন রেজিস্ট্রার। এরপর ছবিতে বোর্ডের সিল মারা হত। কার্ডের নিচের অংশে রেজিস্ট্রেশন অফিসারের স্বাক্ষরসহ সিল মারা হত। রেজিস্ট্রেশনের দু-টি অংশ ছিল। একটা অংশ বোর্ড রেখে দিত। আরেকটা অংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হত। এরপর পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুদিন পূর্বে বোর্ডে এসে প্রবেশপত্র নিয়ে যেতে হত। এভাবেই পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

ম্যানুয়াল পদ্ধতি ছেড়ে কীভাবে অনলাইন পদ্ধতি চালু হয়েছে তা বোঝাতে আমরা উদাহরণ হিসেবে বেসিক ট্রেড শিক্ষাক্রমকে গ্রহণ করতে পারি। ২০১৬ সালকে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সময় হিসেবে ধরা যায়। ২০১৬ সালে বেসিক শিক্ষাক্রমে প্রায় ২৪০০ প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছে (বছরে ২বার) দুই লাখেরও অধিক। বর্তমান রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি হচ্ছে-একটি নির্দিষ্ট সময়ে বোর্ডের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নোটিশ দেওয়া হয়। ওই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠান কোড ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও ট্রেড অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে Submit বাটনে ক্লিক করলে ফরমটি Submit হয়ে যায়। শিক্ষার্থী যদি এসএসসি পাস হয়, তবে আবেদন ফরমে শিক্ষার্থী তার এসএসসি পাশের রোল নম্বর এন্ট্রি করে। ফলে শিক্ষার্থী যে বোর্ড থেকে পাস করেছে সেই বোর্ডের সার্ভারের সাথে লিংক হয়। এতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের সার্ভার থেকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সকল তথ্য আবেদনপত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। এরপর সেটি প্রিন্ট করে রাখা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বোর্ড নির্ধারিত ফিসহ বোর্ডে জমা দিতে হয় । ফি পে-অর্ডারের মাধ্যমে বোর্ড নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সোনালী ব্যাংক/স্যোসাল ইসলামি ব্যাংক আগারগাঁও শাখায় জমা দিতে হয়। ফিসহ প্রিন্ট কপি রেজিস্ট্রেশন শাখায় জমা দেওয়ার ১৫/২০ দিন পর বোর্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করতে হয়। রেজিস্ট্রেশন কার্ডে ভুল থাকলে জরিমানাসহ আবেদন করে সংশোধন করে নিতে হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ডে নিচের তথ্যগুলো থাকে– প্রথমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের লোগো ও নাম, শিক্ষাক্রমের নাম, ডানপাশে শিক্ষার্থীর ছবি। এরপর পর্যায়ক্রমে (১) শিক্ষার্থীর নাম (২) পিতার নাম (৩) মাতার নাম (৪) পুরুষ/মহিলা (৫) প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড (৬) পোস্ট অফিস (৭) উপজেলা/থানা (৮) জেলা (৯) ট্রেড/টেকনোলোজির নাম ও কোড (১০) রেজিস্ট্রেশন নম্বর (১১) সেশন। রেজিস্ট্রেশন কার্ডের নিচে স্বাক্ষর করার জন্য তিনটি ঘর থাকে। প্রথমটি শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর, দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর এবং তৃতীয়টি উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন)-এর স্বাক্ষর।

বেসিক ট্রেড শিক্ষাক্রমের মত এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইচএসসি (বিএম) ও ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াও এখন অনলাইন পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন করা হলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া User friendly আরও উন্নত হবে বলে আশা করা যায়।

পিবিএম (PBM) সহজীকরণ

কামরুন নাহার

নতুন সৃষ্টিতে আনন্দ মানুষের স্বভাবজাত; সদ্যজাত শিশুটি ক্রমেই মুহূর্তে মুহূর্তে নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে আনন্দে জীবনের পথ চলতে থাকে। চলতে চলতেই গড়ে তুলে এক বিশাল কর্মপরিধি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে, ত্যাগ তিতিক্ষায় স্বাধীন বাংলাদেশে জন্মে আমি ধন্য।

সব কাজে আইসিটিকে ব্যবহার করে দ্রুত দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে অনুভব করি নতুন শিহরণ। আমার কর্মক্ষেত্রের সব জায়গায় কীভাবে আইসিটিকে ব্যবহার করা যায়, তা ভাবতে থাকি প্রতিনিয়ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহজীকরণ (ISAS) এ ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে প্রায়ই অংশগ্রহণ করতে হয় বিভিন্ন ধরনের কর্মশালায়। তেমনি একটি নাম পিবিএম-কর্মশালা। মাঠ পর্যায়ের এ কর্মশালা প্রতিটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। পিবিএম কী, কীভাবে এর কার্যক্রম আরো সফলভাবে করা যায়, ISAS কী ইত্যাদি আলোচনা করা হয় এই কর্মশালায়। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নানা ধরনের কথা ও প্রশ্ন শুনে এগুলোর উত্তর দেওয়া এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করি।

প্রায় প্রতিটি কর্মশালায়ই শিক্ষকগণ জানান যে তাঁরা ISAS ফরম এবং নির্দেশিকাসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে তাদের হাতে পান। এরপর তা নিয়মানুযায়ী পূরণ করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে জমা দেন। তার পর ধাপে ধাপে সংগ্রহ করা হয়। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং সারাদেশের তথ্য এবং প্রতিবেদন একত্রিত করে সমন্বিতভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণকৃত ISAS ফরম এবং নির্দেশিকাসমূহ কীভাবে পাওয়া যায়– এ ছিলো আমাদের ভাবনা। আমার মনে হলো যদি আমরা ISAS ফরমটি EMIS Cell-এর পোর্টালেই আপলোড করি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ আইডি-এর মাধ্যমে অনলাইনে সরাসরি EMIS Cell পোর্টালে প্রবেশ করে ISAS ফরমটি পূরণ করতে পারে, তাহলে ডাকযোগে পাঠানোর সমস্যা থাকবে না। আর সহজেই প্রতিষ্ঠানে বসেই প্রধান শিক্ষক ছকটি পূরণ করে দিতে পারবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে বা শিক্ষা কর্মকর্তাকে কোনো দৌড়ঝাঁপ করতে হতো না। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সমস্ত তথ্য পেতে এবং পর্যালোচনা করে সুন্দর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারি।

a2i- এর উদ্যোগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে আমরা 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক দুই দিনের একটি প্রশিক্ষণ শেষে আমার চিন্তা আরও বেশি দৃঢ় হয়। প্রশিক্ষণে আমাদেরকে 'উদ্ভাবন প্রকল্প ছক' প্রদান করা হয়। এবার আমি আমার আইডিয়াটিকে উক্ত ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করি। বিশ্লেষণের পর আমি আনন্দিত হই। মনে হলো আমি কিছু একটা কৌশল পেয়ে গেছি। কারণ, এর মাধ্যমে আমি ভরসা করতে পেরেছি যে, এই উদ্ভাবনের ফলে পিবিএম আওতাভুক্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো উপকৃত হতে পারে।

গবেষণা কর্মকর্তা(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ

অন্বেষার আলো অন্বেষণ

মো. মাহফুজুর রহমান

দিঘলিয়া উপজেলাধীন সেনহাটি ইউনিয়নের সেনহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠদান প্রক্রিয়া দেখার জন্য ক্লাসে যাই। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে জানতে পারি যে, মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদান কম হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট আরও কিছু জানতে চাই। অন্বেষা নামে এক ছাত্রী হঠাৎ জানতে চাইলো– আমরা কি আরও বেশি 'মাল্টিমিডিয়া' ক্লাস পেতে পারি না? তার প্রশ্ন আমাকে উদ্বেলিত করলো এবং আমি অন্বেষাকে প্রশ্ন করলাম– কেন তুমি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করতে আগ্রহী? উত্তরে সে বলল, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে বিষয়বস্তু ছবিতে বোঝানো হয়, আর ছবিগুলো মনে থাকে। সেজন্য পড়া ক্লাসেই করে ফেলি। এজন্য আরও বেশি ক্লাস হলে আরও ভাল করে পড়াটা বুঝতে পারতাম। অতঃপর প্রধান শিক্ষকের রুমে গিয়ে অন্বেষার আগ্রহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় জানতে পারি মাত্র ২/৩টি বিষয়ে বছরে ২/৩ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেন। ফলে কেবল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ এই পাঠদানে আগ্রহী হন না। যে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হয় না, প্রধান শিক্ষকের সাথে বিস্তারিত আলোচনা শেষে মনে হল– কিছু করা প্রয়োজন।

মনের মধ্যে তাগিদ অনুভব করলাম এবং বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলাম। এর মধ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই এবং উল্লিখিত বিষয়ের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সেবা সহজীকরণসহ গুণগতমান উন্নীতকরণের জন্য একটি ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণ করি। আইডিয়ার নাম ছিল, 'Self sustainable প্রক্রিয়ায় ইন-হাউস প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদান বৃদ্ধিকরণ'। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের মাধ্যমে একজন কম্পিউটার না–জানা শিক্ষককে এবং কম্পিউটারে প্রাথমিক ধারণাসম্পন্ন শিক্ষককে ১৫দিনব্যাপী ১ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কম্পিউটারে দক্ষতা প্রদান করবে। অতঃপর অল্প জানা শিক্ষক কম্পিউটার সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হবেন। তিনি পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন এবং একেবারেই কম্পিউটার না–জানা শিক্ষক কিছুটা ধারণাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হবেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে যাবেন এবং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ক্লাসে পাঠদান প্রক্রিয়া শুরু করবেন। কেউ আর অনীহা প্রকাশের সুযোগ পাবেন না এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানে আন্তরিক হবেন। উক্ত প্রক্রিয়াটি তদারকি করবেন প্রধান শিক্ষকসহ দু-জন শিক্ষক, এস এম সির দু-জন অভিভাবক সদস্য, পিটিএ-অভিভাবক সদস্য এবং সর্বোপরি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার। বিদ্যালয়ের বিদ্যমান কম্পিউটার দিয়েই প্রশিক্ষণ চালানো হবে। কাজটি শুরু করে বর্তমানে ফলাফলে দেখা যায় ৩ জন শিক্ষক থেকে ৩৩ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষ হয়েছেন। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ৮০

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, দিঘলিয়া, খুলনা

থেকে ৯০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এসএসসি পাসের হার ৮৬ থেকে ৯৭ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫ থেকে ২২ জনে উন্নীত হয়েছে। পাইলটিং চলাকালে তদারকির জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে পুনরায় অন্বেষার কাছে প্রশ্ন করি– এখন ক্লাস কেমন লাগছে? উত্তরে সে বললো– আলোর সন্ধান পেয়েছি, এ আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে চাই। আমিও তার জবাবে খুশি হলাম। যদি এভাবে অন্বেষাদের আলোর অন্বেষণে এগিয়ে নেওয়া যায়, তবেই দেশ আলোকিত হবে।

ইনোভেশন

কামরুজ্জামান মো. জাহাঙ্গীর হুসাইন মিঞা

'আমাকে তোমরা একজন শিক্ষিত মা দাও,
আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব'

বাংলাদেশে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে সরকারি উদ্যোগে উপবৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়। এর ফলে ফুলের পাপড়ির মত ছোট ছোট মেয়েরা ব্যাপক হারে স্কুলে আসা-যাওয়া শুরু করে। ২/৩ বছরের মধ্যেই দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপবৃত্তি কার্যক্রমের ইতিবাচক পরিচিতি তৈরি হয়। ঝরে পড়া মেয়েরা আবার স্কুলমুখি হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সরকারের এ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা শুরু হয়। কিন্তু উপবৃত্তি কার্যক্রমের এমন সফলতার মাঝে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা সমাধানে ভাবতে থাকি। মনের মধ্যে চরম অশান্তি অনুভব করতাম সারাক্ষণ। অতঃপর ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে এক শুভলগ্নে a2i কর্তৃপক্ষের ডাকে সাড়া দিয়ে খুলনার আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে ইনোভেশনের ধারণা পাই। প্রথমে ইনোভেশন কথাটি শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এটা আবার কি? এমন প্রশ্নই মনে এসেছিল বারবার। পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণের কোন এক পর্যায়ে বুঝতে পারলাম ইনোভেশনের অর্থ হলো– 'কোন পুরনো বা কোন নতুন সেবাকে জনগণের হাতের কাছে অধিকতর সহজভাবে তুলে ধরা'। চোখের পলকে মাথায় এলো তাহলে এবার উপবৃত্তি বিতরণে নিশ্চয়ই নতুন একটা ধারণা আনা যেতে পারে।

একটি রাত প্রায় নির্ঘুম কাটিয়ে দিলাম বিষয়টি ভেবে। অতঃপর মনে হলো, ব্যাংক-বুথ করে যেভাবে নগদ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে বিতরণ করা হয় সেটাকে যদি আধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান করা যায়; তাহলে নিশ্চয়ই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এক পর্যায়ে মনে হলো, যদি মোবাইল ব্যাংকিং–এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ করা যায় তাহলে বিষয়টি কেমন হবে? প্রশিক্ষণের পরবর্তী দিনেই আমরা নতুন এই আইডিয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করি। ধারণাটি তাঁর পছন্দ হওয়ায় এ বিষয়ে পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। খুলনায় পাঁচ দিন প্রশিক্ষণ শেষে ডাক পেয়ে যাই বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভারে। সেখানে তিন দিনের প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে আমাকে পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য। আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আমার ইনোভেশন ধারণাটি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করি। উপস্থাপন শেষে উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব এ.এস মাহমুদ (সাবেক অতিরিক্ত সচিব) আমার আইডিয়াটিকে গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত শিক্ষা অধিদপ্তর ও উপবৃত্তি বিতরণ কর্তৃপক্ষকে আমার নতুন ধারণাকে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আমাকে পুরস্কৃত করেন। ফিরে আসি আমার কর্মস্থল যশোর সদর উপজেলায়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চৌগাছা, যশোর

শুরু করি আমার ধারণা বাস্তবায়নের পাইলটিং কার্যক্রম। নিয়ম অনুযায়ী আমি পাইলটিং-এর জন্য অনুমতি চেয়ে আমার কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার পাইলটিং–এর পরিবর্তে আমার ইনোভেশন ধারণাটিকে দেশব্যাপী বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। শুরু হয় দেশের ২১৮টি উপজেলায় একযোগে মোবাইল ব্যাংকিং–এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের প্রক্রিয়া। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি এ কর্মযজ্ঞে। অনলাইনের মাধ্যমে উপবৃত্তির জন্য আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন পর্ব শেষে নতুন নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে খোলা হিসাবে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ শুরু হয়। যেন এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন। নতুন এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের থাকলো না তেমন কোন ভোগান্তি বা অর্থ খরচ। সময়ও লাগলো নাম মাত্র। উপবৃত্তি বিতরণে সমস্যা দূর হলো। পূরণ হলো আমার স্বপ্ন। কিছু দিনের মধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়েও একই পদ্ধতি অনুসরণের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। আমি আজ পুলকিত এই ভেবে যে, দেশব্যাপী মোবাইল ব্যাংকিং–এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণের যুগান্তকারী যে পদ্ধতি বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেটার স্বপ্নদ্রষ্টা আমি।

২০১৪ সালের জুলাই মাসে আরপিএটিসি খুলনার প্রশিক্ষণ সেশনে বসে এই স্বপ্নই আমি দেখেছিলাম। আজ আর আমার কাছে ইনোভেশন কথাটি দুর্বোধ্য নয়। কেননা আমি নিজেই আজ ইনোভেশন, এ যেন আমার একার সৃষ্টি। তাই আমি তৃপ্ত আজ-সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। আমার উদ্ভাবিত পথে উপবৃত্তির সুফল ভোগ করছে আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি গ্রহণকারী নতুন প্রজন্ম। যারা পরিপূর্ণতা দেবে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নকে।

শিক্ষার্থীদের মনন গঠনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

মো. মহিউদ্দিন

বহু বছর ধরে শিক্ষা পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শিক্ষা কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে ধন্য মনে করছি। নিজ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে কিছু কিছু সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান এবং বাস্তবায়নে সহায়তা আমার নৈতিক দায়িত্ব। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও পিটিএ সদস্যদের আন্তরিকতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাবে প্রতিষ্ঠানের জনবল ও শিক্ষার্থীদের পরিবেশ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয় না। ফলে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দমুখর থাকে না, পাঠদান আকর্ষণীয় হয় না। প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনা, যাতায়াত এলাকা, শ্রেণিকক্ষ ও টয়লেট অপরিচ্ছন্ন থাকে। শিক্ষা উপকরণ পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। এ সকল সমস্যার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়মুখি থাকে না, উপস্থিতির হার কম হয়, আশানুরূপ ফলাফল করে না। শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠান হতে ঝরে পড়ে।

a2i-এর উদ্যোগে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সৃষ্ট ধারণা বা আইডিয়াকে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। লক্ষ নির্ধারণ করে রামকৃষ্ণপুর এম এ জলিল উচ্চবিদ্যালয়ে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। সমস্যা সমাধানে গৃহীত উদ্যোগে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে আইডিয়াটি অবহিত করা হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যদের নিয়ে সভা করা হয়। পরিচ্ছন্নতা, গাছপালা ও ফুলবাগান তৈরি এবং পাঠদান আকর্ষণীয় করা বিষয়ক দল গঠন করা হয়। গৃহীত উদ্যোগের কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষার্থীগণ নিজেরাই তাদের দলের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষসহ প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনা ও টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি, পিটিএ সদস্য ও কর্মচারীদের মাধ্যমে দল গঠন করে গাছপালা, ফুলগাছ রোপন ও পরিচর্যা করবে। উল্লিখিত দলের মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ গতিশীল করাসহ শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া স্টুডেন্ট কেবিনেট সদস্যগণও সকল দলকে সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Second Home) কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রবল আগ্রহ লক্ষ করা যায়। অধিক শিক্ষার্থী এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি, পিটিএ সদস্য ও কর্মচারীদের নিয়ে শ্রেণিভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক 'ইনোভেশন ওয়ার্ক ইউজার গ্রুপ' নামে চারটি দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দলে একজন শিক্ষক, একজন এসএমসি সদস্য, একজন কর্মচারীসহ শিক্ষার্থীগণ থাকবে। বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন দল ১৩ সদস্য বিশিষ্ট, গাছপালা লাগানো, ফুলবাগান তৈরি ও পরিচর্যা দল ১৩ সদস্য বিশিষ্ট, বিদ্যালয় ওয়াশরুম পরিচ্ছন্ন দল (ছাত্র ৮ জন, ছাত্রী ৮ জন) ১৬ সদস্য বিশিষ্ট এবং শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ

নিশ্চিতকরণ দল সকল শ্রেণিতে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট। প্রতিটি দলে শিক্ষকের পরামর্শ, এসএমসি সদস্যদের সহায়তা, শ্রেণিভিত্তিক দলের শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিদিন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম শুরুর পূর্বে ও পরে উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। গৃহীত কার্যক্রমে ক্লাসরুমের সামনে ময়লার ঝুড়ি ও বিদ্যালয়ের চারদিকে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা হয়। ক্লাসভিত্তিক প্রচারণার ফলে শিক্ষার্থীগণের মধ্যে নিজ উদ্যোগে ঝুড়ি ও ডাস্টবিন ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। তা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।

এ উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীগণ আত্মনির্ভরশীল মানসিকতায় গড়ে উঠেছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ফলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের চারপাশ ও ভিতরের পরিবেশ সুন্দর হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে টয়লেট ব্যবহারের ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারের ফলে পাঠদান আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, পরীক্ষায় ফলাফল ভাল করছে। ফলে, শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্যোগ বাস্তবায়নে কিছু সংখ্যক অভিভাবক সদস্যের অনাগ্রহ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেকে আত্মনিবেদিত সমন্বয়কারী হিসেবে সক্রিয় থাকতে হয়। এ উদ্যোগ পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাস্তবায়ন করা হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লিখিত ফলাফল পাওয়া যাবে বলে আমি নিশ্চিত। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ শিক্ষার্থীগণকে অধিক সময় প্রতিষ্ঠানে অবস্থানে আগ্রহী করে তোলে। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ প্রাণচঞ্চল থাকে। শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে।

সক্রিয় পাঠদান

মো. আব্দুস সাত্তার সরকার

দিনটি ছিল মঙ্গলবার। বেলা ১০.৩০ মিনিটে আকস্মিকভাবে একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাই। বিদ্যালয়টি সরকারি দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট। বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ১০। উপস্থিত পাওয়া গেল ৬ জন। সরাসরি প্রথম শ্রেণির ক্লাসরুমে প্রবেশ করলাম। শিক্ষার্থীরা হৈচৈ করছে। শিক্ষিকা চেয়ারে বসে মোবাইল ফোনে কিছু একটা করছেন। আমাকে দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। শিক্ষক সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন অবস্থায় ক্লাস রুমে এসেছেন। তার কাছে কোন পাঠ পরিকল্পনা নেই। পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি যা বলছেন; শিক্ষার্থীরা তার সঙ্গে পরিচিত নয়। যা-ই হোক অফিস রুমে ফিরে আসলাম। অফিসরুমে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়ার ওপর ধুলার আস্তরণ পড়ে গেছে। প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, সেখানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর খুব কম ব্যবহার করা হয়।

কিছুক্ষণ পর উল্লিখিত সহকারী শিক্ষক ক্লাস শেষ করে অফিস রুমে ফিরে এলেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে, তিনি নিজে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে বললাম যে, আমি তার পরবর্তী একটি ক্লাস দেখবো। যথারীতি প্রস্তুতি নিয়ে তিনি ক্লাসে গেলেন। তিনি অসাধারণ এক ক্লাস নিলেন। শিক্ষক সক্রিয়, শিক্ষার্থীরা সাড়া প্রদান করছে, দলীয় কাজ, একক কাজ, বোর্ডের ব্যবহার, শিখনফল অর্জনের জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল– এককথায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি আকর্ষণীয় ক্লাস তিনি উপহার দিলেন। আমি কোনোভাবেই তার আগের পাঠদানের আচরণ ও পরের আচরণ মেলাতে পারছিলাম না। তিনি কেন আগে এভাবে ক্লাসরুমে নির্বিকার ছিলেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম নয়। শিক্ষক হিসেবে যোগ্যতাও তার যথেষ্ট। তাহলে কেন একই শিক্ষক দু-রকম আচরণ করছেন। কর্তৃপক্ষের সামনে এক রকম, কর্তৃপক্ষের অগোচরে আরেক রকম। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর

মোবাইল ব্যাংকিং

লিপিকা দত্ত

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি চালু হওয়ার সময় রংপুর সদর উপজেলায় কর্মরত ছিলাম। উপবৃত্তি প্রদানের সময় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা যেতো পরীক্ষার প্রস্তুতি ফেলে রেখে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে আসতে হচ্ছে। কিছু শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ করা সম্ভব হতো না অনুপস্থিতির কারণে। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রদত্ত অভিভাবকের আয়ের সনদের ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষার্থী নির্ধারণ করতে হতো। ফলে সবসময় সঠিক তথ্য থাকতো না। Workshop on innovation in public service-এ সুযোগ আসায় আমি উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে একটি আইডিয়া গ্রহণ করি।

আইডিয়াটি বাস্তবায়নে অনেক বাধা আসবে জেনেও এগিয়ে যাই। উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় প্রথমে বিষয়টির অনুমোদন গ্রহণ করি ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে। এরপর ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করে একটি অভিন্ন ভর্তি ফরম প্রস্তুত করি; যেখানে বোর্ড-এর প্রয়োজনীয় তথ্যের সাথে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো থাকবে। এই ফরমে ভর্তি করে শিক্ষার্থীর ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। ২০১৫ সালের ২ এপ্রিল ডাংগিরহাট স্কুল এন্ড কলেজে এবং ৪ঠা এপ্রিল তারাগঞ্জ বালিকা স্কুল এন্ড কলেজে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, জিবি সদস্যসহ মতবিনিময় সভা ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে প্রথমে যোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করি। পরবর্তী ধাপগুলো ছিল চ্যালেঞ্জিং, তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতায় পেরিয়ে গেলাম সকল বাধা।

২০১৫ সালের ৭ এপ্রিল অনলাইনে ফরম পূরণসহ মোবাইল ব্যাংকিং-এর অনুমোদনের জন্য সচিব মহোদয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়; এর ফলে ২টি ভিন্ন ফরম (১টি আবেদন ফরম এবং অন্যটি অভিভাবকের আয় সম্বলিত তথ্য ফরম) এর পরিবর্তে শুধু শিক্ষার্থীর নামের তালিকা পাঠানোর নির্দেশনা প্রদান করে ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিল প্রকল্প পরিচালক মহোদয় পত্র প্রেরণ করেন। এর সমাধান হলো- ২০১৫ সালের ২ জুন 'শিক্ষার্থী মোবাইল ব্যাংক একাউন্ট' খোলার আদেশের মাধ্যমে। সর্বশেষে ২০১৫ সালের ৩০ জুন শিক্ষা সচিব মহোদয় একাদশ শ্রেণি এবং ২০১৫ সালে ১৬ আগস্ট মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে সূচিত হলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত, USEO, ব্যাংক কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলের সময় সাশ্রয় হলো আর সহজতর হলো উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তারাগঞ্জ, রংপুর

বিন্দু থেকে সিন্ধু

মো. আবুল কালাম আজাদ

অনেক দিন আগের কথা। যখন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের শিক্ষা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যে ব্যস্ত, ঠিক তখনি সমাজকে এগিয়ে নেয়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁরই প্রিয় জন্মভূমি রংপুরের অন্তর্গত আজকের গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ১৯১৬ সালে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে পথচলা শুরু করে। শুরুতে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজপতিদের রক্ত চক্ষু ও শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা। তৎকালীন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ দমে না গিয়ে সকল বাধাকে ডিঙ্গিয়ে কাজ করতে থাকেন। ফলে, যে বিদ্যালয়টি ১৯৪২ সালে মাত্র ১০ জন শিক্ষার্থী (ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়) নিয়ে পথচলা শুরু করে সেখানে আজ প্রায় ১২০০ জন শিক্ষার্থী নিয়মিত পড়াশুনা করছে।

২০০৯ সালে গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর থেকেই তাঁর কাছে বেশ কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয়, যা সামগ্রিকভাবে সারাদেশেরই চিত্র। বিশেষ করে শিক্ষক স্বল্পতা, প্রযুক্তি স্বল্পতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ শিক্ষকের অভাব, পরিবেশ শিক্ষাবান্ধব না হওয়া, প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব ইত্যাদি। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটানো নিয়ে চিন্তা ভাবনাসহ বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করতে থাকেন। এরই মাঝে রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের কার্যালয় হতে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ আসে এবং প্রশিক্ষণ শেষে কাজ করার সুযোগ প্রসারিত হয়। এ ছাড়াও a2i-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও প্রকল্প উপস্থাপনসহ বিভিন্ন সেমিনারে অংশ নেয়ায় কাজের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের কার্যালয় হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনার আলোকে উল্লিখিত সমস্যাগুলি সমাধানে মতবিনিময় করে বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে নিচের পদক্ষেপগুলো হাতে নেওয়া হয়। শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাক্তন মেধাবী শিক্ষার্থীদের দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ও দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। যুগোপযোগী উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ শিক্ষক তৈরি করতে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিমাসে শিক্ষকদের সমিতির মাধ্যমে ৩,০০০ টাকা করে সম্মানীসহ ২জন শিক্ষককে ল্যাপটপ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইতোমধ্যে ২৪ জন শিক্ষক ল্যাপটপ পেয়েছেন এবং ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সকল শিক্ষক ল্যাপটপ পেয়ে যাবেন। বিদ্যালয়টির পরিবেশ শিক্ষাবান্ধব করতে সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

১. শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূরীকরণে একটি অব্যবহৃত দ্বিতল ভবনকে সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করা হয়। ফলে ৮০ জন শিক্ষার্থী ছাত্রীনিবাসে বসবাসের সুযোগ পাচ্ছে;

প্রধান শিক্ষক, গাইবান্ধা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা

২. একটি পরিত্যক্ত কুয়া (ইন্দারা) মেরামত করে রিজার্ভ ট্যাংক হিসেবে পানি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে;
৩. পুরোনো টয়লেটসমূহ সংস্কার ছাড়াও আরও ছয়টি নতুন টয়লেট তৈরি করা হয়েছে;
৪. শিক্ষার্থীদের প্রার্থনার জন্য অযুখানাসহ নামাজের জায়গা তৈরি করা হয়েছে;
৫. পরিত্যক্ত জমিতে লেবু বাগান, পেঁপে বাগান এবং রাস্তার দু-পাশে সৌন্দর্যবর্ধক দেবদারু ও নারিকেল গাছের সারি সারি অবস্থান সকলের নজর কাড়ে;
৬. বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি ও সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল, ফল, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা দিয়ে নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে;
৭. সর্বোপরি ক্যাম্পাসকে পরিচ্ছন্ন রাখতে বিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ করা হয়।

কমিউনিটির সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করার উদ্দেশে অভিভাবক সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও বরেণ্য শিক্ষাবিদ, প্রোথিতযশা সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রায়ই অনুপ্রাণিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে ডায়নামিক ওয়েবসাইট তৈরি করে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে অভিভাবক মহল ও শিক্ষার্থীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়। বিদ্যালয়টির মনোরম পরিবেশ দেখতে ইতোমধ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর, জনাব মিনু শীল, জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত জনাব নিলীমা আখতার বাণী (যুগ্মসচিব), a2i প্রকল্পের ডোমেইন স্পেশালিস্ট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (উপ-সচিব)সহ অনেকে পরিদর্শন করে বিদ্যালয়টির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের 'শতবর্ষ স্মরণ বৃত্তি-২০১৭' বাৎসরিক ৩০০০০.০০ (ত্রিশ হাজার), কানাডা প্রবাসী ড. শ্রীশচন্দ্র বৃত্তি, বাৎসরিক ২০০০০.০০ (বিশ হাজার) ছাড়াও বিদ্যালয় থেকে আর্থিক সহযোগিতা করায় দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দমুখর পরিবেশে পাঠগ্রহণ করে দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসতে পারে সে জন্য আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকায় এ প্রতিষ্ঠানে তৈরি হচ্ছেন নিচ্ছে অনেক জ্ঞানী–গুণী। জাতি পাচ্ছে দক্ষ জনশক্তি। উল্লেখ্য যে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি বিদ্যালয়টি আড়ম্বরপূর্ণ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন করে। এ অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) জন প্রোথিতযশা ও বিভিন্ন পর্যায়ের অবদান রাখা প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে এক বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় সংসদ সদস্য বেগম রওশন এরশাদ (মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা), মাহাবুব আরা বেগম গিনি (মাননীয় হুইপ) ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক (যুগ্মসচিব) নিলীমা আখতার বাণীসহ ১০ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান এবং ফলাফলের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করেছে এবং এসএসসিতে ৯৯ শতাংশ পাশ করেছে। ফলে, প্রতিষ্ঠানটি জেলা পর্যায়ে (২০১৬ সালে) এবং জাতীয় পর্যায়ে (২০০৩ সালে) শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করে।

অ্যালবাম

Review workshop on Innovation of Ministry of Education
Capturing Best Practices from the Field

আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে
Mobile Banking
3G

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার